প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে অবয়বাদর্শ

দ্রাবিড় সৈকত[১]

গবেষণা-সারসংক্ষেপ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলা ও শিল্পাদর্শ আলাদা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যকে বিবেচনায় না নিয়েই নির্ধারণ করা হয় উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্টতা। এমতাবস্থায় এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলায় মানব অবয়ব রূপায়ণের পশ্চাৎপট। শিল্পকলায় মানব শরীরের উপস্থাপনে এই দুই ধারা বিপরীতমুখী। এর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ও ভৌগোলিক কারণ। প্রাচ্যের শিল্পকলায় শরীর এসেছে বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, পশ্চিমে এসেছে একটি আদর্শবাদী অবস্থান থেকে, অথচ শিল্পী ও তাত্ত্বিকমহলে এর বিপরীত মতই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নারী-পুরুষের দেহাবয়বের ক্ষেত্রে পশ্চিম পুরুষতান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে শিল্পকর্মে উপস্থাপন করেছে। তাদের চিত্রিত পুরুষদেহ অতিরিক্ত পেশিবহুল, পরাক্রমশালী ও বীর হিসেবে উপস্থাপিত। বিপরীতে নারীদেহ কোমল, ভোগের সামগ্রী, অবলা, পরনির্ভরশীল যা সাধারণ নারী-পুরুষদেহের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। প্রাচ্যশিল্পে পুরুষ অতিরঞ্জিত পেশিবহুল নয় এবং নারীও পাশ্চাত্য ধারণার মতো কোমল-কমনীয় নয়; পুরুষ ও নারী দুই পক্ষই এখানে তাদের স্বাভাবিকতা নিয়ে শিল্পকলায় উপস্থাপিত। পাশ্চাত্যের বাস্তবতাবাদী শৈলীর অহংকার প্রকৃতপক্ষে একটি বহুল প্রচলিত মিথ, যার সাথে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। পশ্চিমের দেহ বিষয়ক ধারণা স্থূল বহিরঙ্গের একপেশে নির্মাণ। প্রাচ্যে দেহ কেবলই বাহ্যিক অবয়ব নয়, আরো গভীর উপলব্ধির বিষয় জড়িত দেহের সাথে। ফলে প্রাচ্যের নারী এবং পুরুষ দেহের রূপায়ণ পশ্চিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পশ্চিমের মতো এখানে নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রী নয়, সে সৃষ্টিশীল স্বতন্ত্র সত্তা। পুরুষও এখানে আক্রমণকারী, পেশিবহুল, শক্তপোক্ত শরীরের আগ্রাসী চরিত্র নয়। তাই এ বিষয়ে তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যা স্বতন্ত্রভাবে কোনো গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাচ্যশিল্পকলার অবয়বাদর্শের সাথে পাশ্চাত্যশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হওয়ায় প্রবন্ধটিকে বিশ্লেষণধর্মী প্রয়াস বলে গণ্য করা করা যায়, যা প্রাচ্যশিল্পের স্বাতন্ত্র্যকে সমুন্নত করবে বলে আশা করা যায়।

Abstract : Eastern and Western arts and philosophies are distinct based on different characteristics. Excellence or inferiority is determined without taking this distinction into account. In this case, the subject of this article is the background of the transformation of the human form in Eastern and Western art. These two trends are opposite

[১] পিএইচ. ডি, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। Email: saikot81@gmail.com

in the representation of the human body in art. There are specific philosophical and geographical reasons behind this. In Eastern art, the body comes from a realist perspective, in the West from an idealist position, while the opposite is established in artistic and theoretical circles. Western ideas of patriarchal superiority in relation to male and female bodies are presented in artworks. Their depicted male body is presented as overly muscular, powerful and heroic. In contrast, the female body is soft, consumptive, passive, dependent, which is inconsistent with the normal female-male body. In Oriental art the man is not exaggeratedly muscular and the woman is not as soft and graceful as the Occidental conception; both male and female sides are represented here in their naturalness in art. The conceit of the Western realist style is actually a widely held myth, which has nothing to do with reality. Western conceptions of the body are a one-sided construction of the gross exterior. In the East, the body is not just an external appearance, but a deeper perception of the body. As a result, the body image of women and men in the East is not similar to that of the West. Like in the West, here women are not objects of men's enjoyment, she is a creative individual being. The male is not the aggressor here either, the aggressive character with muscular, strong body. Therefore, theoretical judgment analysis is needed in this regard. Which was not observed in any study independently. As the present essay presents a comparative discussion of Oriental art with Occidental art on the basis of data, the essay can be considered as an analytical effort, which is expected to promote the distinctiveness of Oriental art.

চাবিশব্দ: আকাঙ্ক্ষা, নারী-পুরুষ, দেহ-সাধনা, আদর্শ, যোগ।

Keywords: aspiration, male and female, pursuit, ideal, yoga.

ভূমিকা

শিল্পকলায় মানব অবয়বের উপস্থাপন একটি প্রাচীন বিষয়, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে মানব অবয়বের উপস্থাপন হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আঙ্গিকে। কে কিভাবে উপস্থাপন করবে সেটি কেমন করে নির্ধারিত হয়? এখানেই জীবনবীক্ষা বা মতাদর্শের প্রশ্ন। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কারো উপস্থাপনই মতাদর্শ বহির্ভূত নয়। অর্থাৎ দুই পক্ষই তাদের সুনির্দিষ্ট আদর্শকে অনুসরণ করে শিল্পকলায় মানব অবয়ব রচনা করছেন। আদর্শ হলো একটি পরিমাপ, যার মাধ্যমে যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে তার মান পরিমাণের বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়। উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর-কুৎসিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সামঞ্জস্যহীন এমন মানদণ্ডগুলো সম্পর্কে যার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় তাই আদর্শ। উত্তরাধুনিক সময়ে এমন বাইনারির বিপদ সম্পর্কে আমরা অবগত থেকেও বলতে পারি এই বৈপরীত্যগুলো সবসময় মন্দ বিষয় নয়, কেননা মানুষের জীবন-মৃত্যুর মাঝপথে কিছু সার্বজনীন বিষয় রয়েছে কোনো তত্ত্বই যাদের স্থানচ্যুত করার সামর্থ্য রাখে না। আধুনিকতা, উত্তরাধুনিকতা কিংবা আদিমতা কোনোটিই সার্বভৌম নয়। প্রত্যেক বস্তু এবং বিষয়ের আলাদা আলাদা আদর্শ থাকে। প্রত্যেক সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ,

ব্যক্তি, বিশ্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, বস্তু ও বিষয়ের আদর্শ আছে। সমাজবিজ্ঞানীরা আদর্শ সম্পর্কে বলছেন, বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ স্থানে বা বিশেষ সময়ে মানুষের কাজের ধরন, চিন্তা, উপলব্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের প্রত্যাশিত রূপ। অর্থাৎ সামষ্টিক কল্যাণকর প্রত্যাশার যে রূপায়ণ সেটিই আদর্শ।

শিল্পের আদর্শ রূপ বলতে আমরা কাকে বুঝবো? আর শিল্পের আদর্শ রূপ কি হওয়া সম্ভব? তাতে কি শিল্পকর্ম একটি বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হবে না? না, কারণ শিল্পের আদর্শ শিল্পকে বৃত্তাবদ্ধ করবে না বলেই শিল্পের আদর্শ হওয়ার যোগ্যতা ধারণ করে। এবং আদর্শ সকল পরিস্থিতিতে একই রকম হয় না। নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূমির গঠন, উৎপাদন ব্যবস্থা, জল-বায়ুর ধরন, সামজিক রীতিনীতি, জীবন-দর্শন ও মানুষের চিন্তা-চেতনায় একটি বৃহত্তর ঐক্য প্রাকৃতিক কারণেই বিরাজমান থাকে। এসব বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী তাত্ত্বিক-গবেষকদের ঐকমত্য রয়েছে যে, মানুষ অনেকাংশেই তার ভূ-প্রকৃতি (রোদ, বৃষ্টি, আলো, ছায়া, বাতাস, মাটি, পানি, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা, বিপর্যয়) নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বায়নের ফলে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেলেও মানুষের শরীর ও মনের মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় না। খাদ্যবস্তুর প্রাপ্যতা, গায়ের রং, চেহারার আকার, দেহগঠন, মনন-মানসিকতা, জীবন-দর্শন, ইত্যাদির সাথে মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই আদর্শ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়।

ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতা মানুষের জীবনকে যেমন দিয়েছে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, তেমনি সংস্কৃতিকেও দিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক গড়ন। প্রাচ্য শিল্পকলা তার জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করেই তার নিজস্বতা নির্মাণ করেছে। এখানে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার মিশ্রণ, দেহাত্ববাদী দর্শন, ত্যাগের মানস কাঠামো ইত্যাদির জোরালো উপস্থিতির কারণে শিল্পধারায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রচিত হয়েছে। অল্প কথায় আমরা বলতে পারি প্রাচ্য শিল্পকলা দেহাত্মবাদী দর্শনের মতোই দেহ বা শরীরকেন্দ্রিক নির্মাণ। সেই শরীরও পাশ্চাত্যের অর্থে শরীর নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রাচ্য ধারার শরীর, যেখানে শক্তিশালী রেখার উপস্থিতিতে কর্মক্ষম শরীরের প্রধান্য দেখা যায়। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানসহ কালের করাল গ্রাস থেকে বেঁচে যাওয়া শিল্পকর্মসমূহ বিশ্লেষণে যার যথার্থতা পাওয়া যায়। প্রাচ্য শিল্পদর্শনের প্রধানতম অভিমুখ দেহ বা শরীর হওয়ায় প্রথমেই দেখে নেয়া যায় এ বিষয়ে প্রাচ্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কী, তাই জেনে নেয়া দরকার শরীর সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য ও সাদৃশ্যসমূহ।

গবেষণা-সমস্যা বিবৃতকরণ :

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাস পদ্ধতি আলাদা, এই দুই ধারার সংস্কৃতি এবং জীবনদর্শনও স্বতন্ত্র। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রধানত পাশ্চাত্য শৈলীর চর্চা এবং এ বিষয়ে নন্দনতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিতকরণ। পাশ্চাত্য পদ্ধতিকে উৎকৃষ্ট মনে করার বিপরীতে প্রাচ্য পদ্ধতির নিকৃষ্টতাও প্রতিপন্ন হয়, যা একটি সর্বৈব বিভ্রান্তির

সৃষ্টি করে। এই বিভ্রান্তি স্থানীয় শিল্পের চর্চার বিষয়ে শিল্পী ও তাত্ত্বিকদের বিমুখ করে তোলে, যা একটি অঞ্চলের শিল্পকলার জন্য গুরুতর বিপর্যয়ের কারণ। তথ্য-উপাত্ত বলছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের অবয়বাদর্শ স্বতন্ত্র হওয়ায় এখানে প্রথমত তুলনাই অসমীচীন, দ্বিতীয়ত যদি তুলনা করে কোনোটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হয় তাহলে যুক্তি-প্রমাণ সাপেক্ষে তার যোগ্য দাবিদার প্রাচ্য শিল্পকলা। অথচ বর্তমান চিত্রটি এর বিপরীত, অর্থাৎ পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যশিল্প কোনোভাবেই উৎকৃষ্ট হতে পারে না। এই অঞ্চলের শিল্পকলার সমৃদ্ধির স্বার্থেই এমন সমস্যার যথার্থ যৌক্তিক সমাধান একটি জরুরি বিষয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলায় অবয়বাদর্শের তথ্য-প্রমাণভিত্তিক একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অবয়বাদর্শ বিষয়ে আলাদা আলাদা গবেষণা সহজলভ্য হলেও এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার স্বতন্ত্র কোনো গবেষণাপত্র অথবা কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাছাড়া এ বিষয়ে রচিত রচনাসমূহ মূলত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অথবা তাদের অনুসারীদের দ্বারা রচিত, যেখানে প্রাচ্যকে অযৌক্তিকভাবে নিকৃষ্ট হিসেবে প্রতিপাদন করা হয়েছে। জীবনাদর্শ, সংস্কৃতি বা প্রতিবেশগত প্রভাবকে উপেক্ষা করে কেবলই পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই যাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। এমন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শিল্পকলায় অবয়বাদর্শে কোনো নির্মোহ রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি এ বিষয়ে একটি মৌলিক রচনা বলে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অবয়বাদর্শ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কিছু সাধারণ ধারণাকে উপস্থাপন করে বিভিন্ন দালিলিক উপকরণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের মাধ্যমে এদের বৈশিষ্ট্যগত সমস্যাকে চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পাঠ/আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির (Content Analysis Method) অনুসরণে উক্ত বিষয়াবলির সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্বাচিত পাঠের নব-পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। যথাযথ অভিনিবেশের সাথে নিরীক্ষিত বিষয়ের মূল টেক্সট বা পাঠ বিশ্লেষণপূর্বক গবেষক নিজস্ব পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরেছেন। বর্ণনামূলক পদ্ধতির (Descriptive Method) অনুসরণ তাই আলোচ্য প্রবন্ধে পরিলক্ষিত হবে। প্রবন্ধের ভিতরে সরাসরি উদ্ধৃতি বা ভাব, ধারণা, বক্তব্য বা প্যারাফ্রেইজিং-এর তথ্যসূত্র (in-text citation) এবং প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জি (References) উল্লেখের কৌশলের ক্ষেত্রে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (American Psychological Association) কর্তৃক প্রকাশিত *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th Edition) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ‘বাংলা একাডেমি’ প্রণীত পদ্ধতি এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে লেখকের অনুসৃত পদ্ধতিকে বজায় রাখা হয়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পে অবয়বাদর্শ

দার্শনিক অবস্থান থেকে আমরা জানি, শরীর বা দেহ সাধনাই প্রাচ্য মতাদর্শের প্রধান অভিলক্ষ্য। প্রাচ্যের শিল্পী যখন তার চিত্র বা ভাস্কর্য রচনা করেছে তখন প্রথমেই তার

সামনে উপস্থিত হয়েছে মানব শরীর। এ অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তৃত "তন্ত্র" একটি পরিপূর্ণ দেহাত্মবাদী ধারা, আধুনিক অর্থে যাকে আমরা বাস্তববাদী বলতে পারি। তন্ত্রের জন্ম ও প্রসার বিশেষত বঙ্গীয় অঞ্চলকে কেন্দ্রে রেখেই ঘটেছে। তন্ত্র ব্যবহারিক জীবনের বিবিধ সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান হাজির করে (যদিও তন্ত্রের পর্যাপ্ত পরিমাণ অপব্যাখ্যার উপস্থিতির কারণে তন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সমসাময়িক সময়ে নেতিবাচক, প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র একটি অত্যন্ত জীবনমুখী ও বাস্তবসম্মত জীবনদর্শন)। তন্ত্রের মূল কথা হলো "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে" অর্থাৎ দেহকে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মনে করে তন্ত্র। সুতরাং তার সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হলো দেহ বা মানব শরীর, পুরো পৃথিবীকে বোঝার প্রাথমিক প্রক্রিয়া হলো নিজ দেহকে বুঝতে পারা, তাকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করা। প্রাচ্যবাসী জনমানুষের হাজার হাজার বছরের তান্ত্রিক সাধনা তাকে সচেতন বা অবচেতনে সমসাময়িক সময়েও তান্ত্রিক ধারারই অনুসারি করে রেখেছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞমহল। যদিও আমরা অধিকাংশ মানুষই নিজেদের তান্ত্রিক ধারার অনুসারী হিসেবে স্বীকার করতে প্রস্তুত নই, কিন্তু আমাদের জীবন-যাপনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমরা তান্ত্রিক মতাদর্শের বাইরে বৃহদর্থে যেতে পারিনি। কেবল বাহ্যিক অস্বীকৃতি ছাড়া এর কোনো ভিত্তি নেই। আমাদের লোকায়ত, চার্বাক, সাংখ্য, যোগ, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের নিবিড় বিশ্লেষণে দেখা যাবে এদের প্রতিটির উৎসমূল তান্ত্রিক মতাদর্শ। প্রাচ্য অঞ্চলে উৎপত্তি এবং প্রভাব বিস্তারকারী সকল মতাদর্শই কোনো না কোনোভাবে তান্ত্রিক মতাদর্শেরই বিস্তার কিংবা তন্ত্র দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তাই এখানে শিল্প, সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনে দেহ সাধনাই মূল কথা। মুশকিল হলো এই দেহ-সাধনা শব্দযুগলের অর্থও এতোটাই বিকৃত হয়েছে যে, এখন দেহ-সাধনা বলতে আমরা যৌন-সাধনা বুঝি। সংক্ষেপে বলে রাখা দরকার যে, দেহ-সাধনা হলো দেহকে কর্মের উপযোগী করে তোলার সাধনা। পৃথিবীর সকল কর্মের সাথে দেহের যথাযথ ও সুস্থ সংযোগ তৈরির সাধনা হলো দেহ-সাধনা। এ অঞ্চলের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবগত কেউ এখন আর একথা অস্বীকার করেন না যে, প্রাচ্যবাসী বিশেষত বঙ্গভূমির সন্তানেরা তান্ত্রিক মতাদর্শের অনুসারি। তান্ত্রিকদের দেহসাধনার পদ্ধতি হলো 'যোগ'। যোগ চর্চার সাথে কোনো বিশেষ ধর্মের সংযোগ নেই। তান্ত্রিক মতাদর্শ সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ায় বিভিন্ন ধর্ম তাদের নিজেদের মতো করে তন্ত্রকে ব্যবহার করেছে। যোগ তন্ত্রের প্রায়োগিক দিক। দেহ-মন, ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ সাধন, এদের সংযোগকে অনুধাবন করতে পারার বিশেষ প্রক্রিয়া হলো যোগ, পরবর্তীকালে যেটি আলাদা হয়ে একটি স্বতন্ত্র দর্শনের মর্যাদা লাভ করে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাদানকারী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের মতামতের ভিন্নতার ফলে যোগ-সাধনার বহুমত এবং বহুপথ তৈরি হলেও মৌলিক যে দেহ-সাধনা বা দেহকে কর্মপোযোগীভাবে প্রস্তুত করার সাধনা এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তাই দেখা যাচ্ছে প্রাচ্য-সন্তানদের জীবনাদর্শ বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই তান্ত্রিক প্রথা-পদ্ধতি এবং এর প্রায়োগিক সাধনা 'যোগ' বিষয়ে বোঝাপড়া অপরিহার্য (যদিও এই প্রবন্ধে তন্ত্র কিংবা যোগ বিষয়ে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই)। প্রাচ্য মতাদর্শ বিশেষত বঙ্গীয় জীবনদর্শনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে যোগের উপস্থিতির কারণেই এখানে শিল্পকলার মূল অভিনিবেশও দেহ বা মানব শরীর। স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে চাইলে তাই

তান্ত্রিক যোগের পরম্পরা সম্পর্কে জানতে হবে। স্থানীয় শিল্পকলায় যোগের ঐতিহ্য, তাৎপর্য এবং প্রভাব সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয় শিল্প বিশেষজ্ঞ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক বিদ্যা দেহেঝিয়া (Vidya Dehejia-1942) ও ডার্লি ইউনার হার্নিশ (Darly Yauner Harnisch) তাঁদের গ্রন্থ *Yoga as a Key to Understanding the Sculpted Body* তে বলেন:

> We must recognize also the significance of the tradition of yoga and its inevitable influence upon art. The Indian artistic tradition ignores the depiction of musculature not through anatomical ignorance or lack of artistic skill, but because the Indian ideal was the yogic body. (Dehejia & Harnisch, 1997, p. 80).

যোগের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এখানকার শিল্পকলাকে বোঝা যাবে না। শিল্পকলা কোনো সমাজবিচ্ছিন্ন কর্ম নয়, আধুনিক সময়ে যদিও একে নানাভাবে সমাজবিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে কিন্তু আদতে সে সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, কেননা মানুষ কোনো যন্ত্র নয়, তার চৈতন্য ক্রিয়াশীল, সে সমাজে সক্রিয়ভাবে বসবাসকারী একজন মনন-মেধাসম্পন্ন প্রাণী। সমাজের প্রভাব, তার জল-বায়ুগত প্রভাব, ভাষা ও সময়ের প্রভাবকে চাইলেই সে এড়াতে পারবে না। কেবলমাত্র অতিসচেতন হয়ে পরিমিতিবোধের ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষমতা তার নেই। তন্ত্র ও যোগ সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রাচ্য অঞ্চলে প্রচলিত থাকায় এখানকার মেধা-মনন ও চেতনায় সচেতন ও অবচেতনে তান্ত্রিক আদর্শ প্রবহমান, শিল্পকলায় এর ছাপ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। শরীর সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে আনার মাধ্যমে শরীরের উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া। প্রাচ্যধারার একজন চিত্রশিল্পী এখানে বাহ্যিক শরীর অঙ্কন করেই তার কাজ শেষ করে না, বরং অঙ্কিত দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন চলমান থাকে, অর্থাৎ এতোটাই বাস্তবসম্মত হয় যেনো মনে হয় রচিত শিল্পকর্মে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপস্থিতি রয়েছে। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁর *The Art of India* গ্রন্থে বলেন:

> Visual art in India is movement translated into measured lines and masses. Breath was known as the principle of all living form, It was therefore a test of a good painter that his figures should appear to breath. In India art the figures are, as it were, modeled by breath, which dilates the chest and is felt to carry the pulse of life through the body to the tips of the fingers. This inner awareness was given permanent shape in art, for it was daily and repeatedly practiced and tested in the discipline of yoga. It was found that by the concentrated practice of controlled breathing, an inner lightness and warmth absorbed the heaviness of the physical body and dissolved it in the weightless 'subtle body', which was given concrete shape by art, in planes and lines of balanced stresses and continuous movement. This

> shape, inwardly realized by yoga, was made concrete in art. (Kramrisch, 1954, p. 27).

প্রাচ্য জীবনাদর্শে দেহ কেবল বাহ্যিক শরীর নয়, দেহ এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি ছোট্ট প্রতিরূপ। দেহকে বোঝার মাধ্যমে, দেহের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে যুক্ত হবার কার্যকরী মাধ্যম দেহ। পশ্চিমা শিক্ষার কারণে দেহ বা শরীর বলতে সমসাময়িক শিক্ষিত মানুষ কিছুটা বিভ্রমে পড়ে যান। কেননা দেহ-সাধনা বলতে তারা বোঝেন স্থূল শরীরের সাধনা। স্থূল শরীর ধারণার সাথে প্রাচ্য ঘরানার দেহাত্মবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইউরোসেন্ট্রিক জ্ঞানালোচনার প্যারাডাইমে বসবাসের সমস্যা হলো একটি একপেশে দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, যা সাধারণত আমাদের ভুল উপসংহারে পৌঁছে দেয়। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর *The Transformation of Nature in Art* গ্রন্থে বলেন:

> In Western art the picture is generally conceived as seen in a frame or through a window, and so brought toward the spectator; but the Oriental image really exists only in our own mind and heart and is thence projected or reflected onto space. The Western presentation is designed as if seen from a fixed point of view, and must be optically plausible. (Coomaraswamy, 1934, p. 29).

শরীরের সাথে মনের সংযোগ এখানে এমন অবস্থানে রয়েছে যে, মনের সম্পূর্ণ গতিবিধি সম্পর্কে অবগত না হয়ে শরীরকে কিছুই বোঝা যাবে না। বাস্তব জীবনে সাধু-সন্ন্যাসী বা যোগীদের যেমন কঠোর তপস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, শিল্পীদের সাধনাও তেমনি নিয়মতান্ত্রিক। প্রাচীন গ্রিসের দেহ নির্মাণ যেভাবে তার বহিরঙ্গ নিয়ে মনোনিবেশ করেছে এই অঞ্চলে একইরকম বিষয় ঘটেনি। এখানে শরীরে আত্মা যুক্ত হয়ে একটি জীবন্ত দেহের প্রতিকল্পে রচিত হয়েছে শিল্পকর্মের দেহ। এবং এই নির্মিতির ক্ষেত্রে শিল্পীদের ছিলো কঠোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। স্টেলা ক্রামরিশ বলেন:

> The Greeks made gods of their marble statues of perfectly proportioned man, In India, the discipline of yoga not only controls the physical body, but purges and rebuilds the whole living being. The human body transformed by yoga is shown free not only from defects, but also from its actual physical nature.
>
> […] The Greeks took as their ideal the disciplined, athletic physical body. The Indians took the disciplined state, or subtle body of inner realization, on which to model the shape of their images. Greek sculptors were not necessarily athletes, nor were all Indian artists yogis. In either case, training and environment equipped them with their own characteristic types and sensibilities. (Kramrisch, 1954, p. 15).

পশ্চিমা শিল্পাদর্শ দিয়ে যেমন পাশ্চাত্য শিল্পকলাকে বোঝা সম্ভব নয়, তেমনি পশ্চিমের দেহ বিষয়ক ধারণা দিয়েও প্রাচ্যের মুখ্যত বঙ্গের দেহ বা শরীরকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পশ্চিম দেহকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখেছে; দেখেছে যে, তার প্রমাণ রয়েছে তাদের দেহ নির্মাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে। পশ্চিম প্রবল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় তাদের নির্মিত পুরুষের চিত্র-ভাস্কর্যকে দেখা যাবে প্রবল পরাক্রমশালী, শক্তিমান একজন মানুষ রূপে। বিপরীতে তাদের নারীর চিত্রায়ণে একেবারেই উল্টো ধারা। নারী দুর্বল, কোমল, পরনির্ভরশীল, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভোগের সামগ্রী রূপে উপস্থাপিত। ব্রিটিশ আর্ট কিউরেটর ও ইতিহাসবিদ লিন্ডা নিড (Lynda Nead 1957) তাঁর *The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality* গ্রন্থে বলেন:

> Anyone who examines the history of western art must be struck by the prevalence of images of the female body. More than any other subject, the female nude connotes ‘Art’. The framed image of a female body, hung on the wall of an art gallery, is shorthand for art more generally; it is an icon of western culture, a symbol of civilization and accomplishment. But how and why did the female nude acquire this status? (Nead, 1992, p.1).

পশ্চিমা চিত্রকলায় দেহ এসেছে তাদের মতাদর্শিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করেই। তাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ শিল্পীদের চিত্রায়ণে ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে নারী শরীর, কিন্তু সেই শরীর পুরুষের ভোগের উপযোগী হওয়ার জন্য যেমন গঠন দরকার ঠিক তেমনিভাবে এসেছে। কেননা সেখানে নারীর অবস্থান একান্তই পুরুষের সহচরী হিসেবে, পুরুষের কামনা বাসনার রূপায়ণ হয়ে। আবার পুরুষ শরীর এসেছে ঠিক উল্টোভাবে শক্তিমান ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে। ব্রিটিশ শিল্প ইতিহাসবিদ ও যাদুঘর পরিচালক কেনেথ ক্লার্ক (Kenneth Clark 1903-1983) তাঁর গ্রন্থ *The Nude: a study in ideal form* এ বলেন গ্রিকরা তাদের অ্যাথলেট নগ্ন শরীরের গঠন নিয়ে গর্ব করতো:

> Greek literature from Homer and Pindar downward contains many expressions of this physical pride, some of which strike unpleasantly on the Anglo-Saxon ear and trouble the minds of schoolmasters when they are recommending the Greek ideal of fitness. "What do I care for any man.?" says the young man Kritobalos in the Symposium of Xenophon; "I am beautiful." And no doubt this arrogance was increased by the tradition that in the gymnasium and the sports ground such young men displayed themselves totally naked. (Clark, 1956, p. 23).

ব্যায়ামাগারে তৈরি হওয়া এসব শরীরের বাহ্যিক গঠনের দিকেই ছিল তাদের লক্ষ্য। পুরুষদের যেমন দেখানো হতো পেশিবহুল ও শক্তিমান হিসেবে, নারীকে তেমনি ফুটিয়ে তোলা হতো কোমল, কমনীয়, রমণীয়, কাম-বাসনা চরিতার্থ করার উপযোগী হিসেবে। তাদের শরীর বিষয়ক মতাদর্শ বা চিন্তা-ভাবনা প্রাচ্যের চেতনার সাথে কোনোভাবেই

সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। লিন্ডা নিড দেখিয়েছেন পুরুষের এমন শক্তিমান শরীর ও বিপরীতে নারীর কোমল দেহ্ পশ্চিমা মানসের একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া:

> It symbolizes the heroic male body – powerful and in, as well as under, control. In his analysis of the violent fantasies of the men of the German Freikorps, Klaus Theweleit has demonstrated the complex psychic compulsions associated with this image of the hard, insulated male body. 25 Within Freikorps ideology, the body of woman is perceived as unstructured. It represents the flood, the human mass; it is soft, fluid and undifferentiated. The warrior male insulates himself from the threat of dissolution into this mass by turning his body into an armoured surface that both repels the femininity on the outside and contains the 'primitive', feminized flesh of his own interior. (Nead, 1992, p. 17).

পুরুষ যোদ্ধা, আক্রমণাত্মক, শক্তিশালী ইত্যাদি প্রতীকে তাদের আগ্রাসী চরিত্রের দিকটিও উন্মোচিত হয়। বিপরীতে নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমা শিল্পে মানব দেহের চিত্রায়ণে তাদের আগ্রাসী চরিত্রের শেকড় প্রোথিত আছে পশ্চিমা দর্শন এবং তাদের ভূ-প্রাকৃতির গঠন ও উৎপাদন ব্যবস্থায়। বছরব্যাপী খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করার জন্য তাদের আক্রমণ করতে হতো কোনো কোনো প্রতিবেশির উপর, ফলত এটি তাদের টিকে থাকার শর্তই বলা যায়। কেনেথ ক্লার্কের ভাষ্য থেকে এর কিছুটা বোঝা যেতে পারে, তিনি বলেন:

> Greek confidence in the, body can be understood only in relation to their philosophy. It expresses above all their sense of human wholeness. Nothing that related to the whole man could be isolated or evaded; and this serious awareness of how much was implied in physical beauty saved them from the two evils of sensuality and aestheticism. (Clark, 1956, p. 24).

ক্লার্ক এখানে সঠিক উপলব্ধি করেছেন বলে মনে করা যায়। তবে শারীরিক সৌন্দর্য তাদের কামুকতা থেকে রক্ষা করেছিলো, না আরো কামুক করে তুলেছিলো সেটি একটি বড় প্রশ্ন। শরীর বিষয়ে তাদের মনন গড়ে ওঠার মূল নিহিত আছে তাদের অনুসৃত জীবনদর্শনের অভ্যন্তরে। ইউনিভার্সিটি ফর ফরেনার্স ইটালির এগ্রিগেট প্রফেসর ক্রিস্টিয়ানা ফ্রাঙ্কো (Cristiana Franco) তাঁর *Shameless: The Canine and the Feminine in Ancient Greece* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন গ্রিকদের নারী-ভাবনার আদি উৎসকে, যার ছাপ পাওয়া যায় পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্পকলায়। ফ্রাঙ্কো বলেন:

> To fabricate the first woman, Zeus assigns each god a task—hence the new creature's name is Pandora, "she who was a gift of all [the gods]," or perhaps "she who received from all [the gods] a gift." The job of shaping the first material goes to the divine artisan Hephaestus, who must mix earth with water and give the clay the seductive appearance

> of a young woman ready for marriage—and his models are the immortal goddesses. At this point his job is done, and around this marvelous automaton the other gods begin to busy themselves, each one ready to contribute with their own specific skill. Athena attends to the woman's education, which in the ancient world essentially consisted in teaching her to work the loom. Aphrodite busies herself in giving Pandora an irresistible charm, pouring over her head that delicate grace (charis), a seductive submissiveness, that provokes torments of desire. But the ambiguous power of eroticism is not the only evil component in this first bride's trousseau. To finish off the wicked work of Zeus, in steps Hermes, whose job is to give Pandora "a bitchy mind [kyneon noon] and a thievish nature." And so Zeus's instructions come to an end. (Franco, 2014, p. 2-3).

নারীর প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা, বিভ্রান্ত, বিপথগামী করার ক্ষমতা রয়েছে; তার বিদ্বেষপরায়ণ মানসিকতা, চৌর্যবৃত্তির স্বভাব এবং চরিত্রহীনতার কারণে তার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তাদের নারীর চিত্রায়ণের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ মিথলজিক্যাল ও দার্শনিক কারণ, নারীকে তারা দেখেছে অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে; আপাত সৌন্দর্যের যে মহিমা গাথা তা আসলে পুরুষের ভোগের প্রয়োজনে নারীকে বোকা বানিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার প্রক্রিয়া। নারী কোনো পরিপূর্ণ মানুষ নয়, সে পরজীবী, পরান্নভোগী। ফ্রাঙ্কোকে উদ্ধৃত করে বিষয়টি আরো বিস্তারিত বোঝা যেতে পারে, তিনি বলেন:

> Of what exactly does this contribution requested of Hermes toward the making of woman consist? What does Hesiod mean when he attributes to Pandora the temperament of a dog and a strong propensity to steal? Concerning the deceitful and thievish (epiklopos) nature of women, we don't need to look far for explanations, since other passages in Hesiod's poems clearly illuminate his opinion on the matter: for a husband, a woman means another mouth to feed. In a rural economy based on male labor, woman is the parasitic element that uses up the supplies stored away with so much toil by the men. In Hesiodic morality, founded wholly on the necessity of agricultural labor, woman constitutes an unproductive element. To cultivate the fields means to earn a living through honesty and justice, and so, those who, like a wife, eat bread without having plowed, reaped, or gathered, live by robbery. It is in this sense, then, that Pandora has the soul of a thief. And naturally, Hermes is the one who gives it to her, since he is the thief of Olympus, the patron god of thieves and the protector of scoundrels. (Franco, 2014, p. 3).

দেখা যাচ্ছে পশ্চিমে পুরুষ ও নারী চরিত্রে প্রকটভাবে বৈপরীত্য আছে। সেই বৈপরীত্য কোনো সাধারণ বিষয় নয়, কেননা মানব সমাজের একটি অংশকে অপর অংশের উপর আধিপত্য করার বিনা প্রশ্নে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় শ্রেষ্ঠ অংশের অর্থাৎ

পুরুষের সেবাদাসী হিসেবেই নারীকে উপস্থাপন করা হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতার আতুড় ঘরে। নারীকে তারা তুলনা করেছে কুকুরের সাথে যার একমাত্র কাজ হলো সকল উপায়ে পুরুষের সেবা করা। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মেডিক্যাল হিউমেনিটিজ এডভোকেট, শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, ওপেন ইউনিভার্সিটির এমিরেটাস অধ্যাপক হেলেন কিং (Helen King 1957) তাঁর *Hippocrates' Woman: Reading the female body in Ancient Greece* নামক গ্রন্থে বলেন:

> Homer's Agamemnon says that nothing is more like a bitch than a woman (Od. 11.427; Vernant 1979: 105). The domestic dog is comparable to woman in Greek thought, being a predatory beast taken into man's service, hovering between wild and tame (Redfield 1975: 193–203): as we will see in Chapter 4, the unmarried girl in particular was seen as naturally wild, 'untamed' (admês) and 'unyoked' (azyga), to be domesticated into the service of culture. In Aristotle, the dog is explicitly seen as an animal sharing some qualities of humanity. For example, in bitches, swelling of the breasts shows they are ready for intercourse 'just as in people' (HA 574b14–16). (King, 1998, p. 24).

পুরুষের সেবা করার উপযোগী হতে হবে নারীর শরীর, নারীর কোনো নিজস্ব সত্তা বা মতামত নেই, পুরুষের ভোগে কাজে লাগাই তার আরাধ্য। তাই সে প্রলুব্ধকর ও দুশ্চরিত্র। এমন সামজিক ও দার্শনিক অবস্থান থেকে পশ্চিম নারীকে উপস্থাপন করেছে তাদের শিল্পকর্মে। তাই তারা বাস্তববাদী দাবি করলেও আদতে তেমনটি নয়। কেননা তারা নারীকে তার বাস্তবতায় চিত্রিত করেনি। চিত্রিত করেছে পুরুষের মানসিক তৃপ্তির উপযোগী করে। পরাক্রমশালী পুরুষের যৌনসঙ্গী হিসেবে কল্পনা করে তারা রূপায়িত করেছে নারীর শরীর। তাদের শরীর বিষয়ক সৌন্দর্যবোধের সাথে রক্ত-মাংসের মানবীর কোনো সম্পর্ক নেই। পশ্চিমের সৌন্দর্য তাই বাস্তবসম্মত নয়, কেননা তারা বাস্তব শরীরকে অনুকরণ না করে কাল্পনিক ও কাঙ্ক্ষিত মাপে এঁকেছে শরীর। প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় শিল্প ও প্রত্নতত্ত্বের ইমেরিটাস অধ্যাপক অ্যান্ড্রু স্টুয়ার্ড (Andrew Stewart 1948-2023) তাঁর গ্রন্থ *Art, Desire and the Body in Ancient Greece* এ বলেন:

> The ancient Greeks were, in actuality, thickset and sturdy, with relatively short lower limbs, judging from the osteoarchaeological material, which in no way coincides with the idealized representation of the human body in Greek sculpture, or indeed with the idealized form of the literary sources. (Stewart, 1997, p. 12).

স্টুয়ার্ট প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের বরাতে বলছেন প্রাচীন গ্রিকরা তাদের কল্পিত ভাস্কর্যের মতো ছিলেন না। সাহিত্যের সূত্রে তাদের একটি কল্পিত আদর্শ রচিত হয়েছে। কাজেই বাস্তবতার যে বড়াই তারা করে এবং উপমহাদেশের শিল্পীদের আদর্শায়িত বলে অবজ্ঞা করে তার কোনো ভিত্তি নেই। তারা একটি কাল্পনিক আদর্শ তৈরি করেছে এবং তার অনুসরণে শিল্পকর্ম রচনা করেছে। পশ্চিমের শিল্পকলায় বাস্তববাদিতা একটি সম্পূর্ণ

কাল্পনিক রূপকথা। যে রূপকথা দিয়ে আমাদের শিল্পী ও তাত্ত্বিকমহল আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। প্রাচীন গ্রিসের শিল্পীরা বিশ্বাস করতো কোনো স্বতন্ত্র শরীর পূর্ণাঙ্গ সুন্দর নয়, ফলত আফ্রোদিতিকে ক্রোটনের পাঁচজন কুমারী মেয়ের নিখুঁত শারীরিক বিন্যাসের বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করে সমগ্রে পরিণত করার মাধ্যমে অঙ্কন করা হয়:

> Former begins with the belief that although no individual body is satisfactory as a whole, the artist can choose the perfect parts from a number of figures and then combine them into a perfect whole. Such, we are told by Pliny, was the procedure of Zeuxis when he constructed his Aphrodite out of the five beautiful maidens of Kroton, and the advice reappears in the earliest treatise on painting of the postantique world, Alberti's Delia Pittura. (Clark, 1956, p. 13).

কাজেই রিয়েলিস্টিক বা বাস্তবতার যে ধারণা সাধারণত পশ্চিম সম্পর্কে করা হয়ে থাকে তার মাঝে বেশ কিছু গুরুতর জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়ে গেছে। তারা তাদের মতো করে একটি আদর্শ দাঁড় করিয়েছে এবং সেই অনুসারে রচনা করেছে শিল্পকর্ম। আর এটি অস্বাভাবিকও নয়, অস্বাভাবিক হলো নিজেদের বাস্তবতাবাদী দাবি করে অন্যদের অবাস্তব বলে চিহ্নিত করা; পশ্চিম যেটি শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে করে এসেছে, বাকী বিশ্ব তাদের নানা কারণে মেনে নিয়েছে। এখন মোটামুটি উন্মুক্ত তথ্য প্রবাহের কালে যা সহজেই সম্ভব নয়। পশ্চিমের মানবদেহ চিত্রায়ণে বেশকিছু অসংগতি স্পষ্ট করেই তুলে ধরা যায়:

১. তাদের নারীদেহের চিত্রায়ণ বাস্তবসম্মত নয়, কেননা তা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আদর্শায়িত কল্পনার রূপায়ণ।

২. তাদের চিত্রিত নারীদেহ নারীকে ভোগের সামগ্রী, অবলা, পরনির্ভরশীল ও দ্বিতীয় সারির মানুষরূপে চিত্রিত করেছে।

৩. তাদের পুরুষদেহ চিত্রায়ণে অতিরিক্ত পেশিবহুল, পরাক্রমশালী, যোদ্ধা ও বীর হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা সাধারণ পুরুষদেহের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

৪. সার্বিক মানবদেহ চিত্রায়ণে তারা কেবল বহিরঙ্গের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে, যেটি মানব চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা মানুষ কেবলই শরীর নয়, দেহ-মন-আত্মার সংযোগ না ঘটলে সেটি পূর্ণতা পায় না।

৫. ন্যুড বা নগ্নতাকে সৌন্দর্য হিসেবে উপস্থাপনের বেলায় তাদের প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

সকল বিবেচনাতেই দেখা যাবে প্রাচীন প্রাচ্য ঘরানার দেহের ধারণার সাথে প্রাচীন গ্রিসের শরীর বিষয়ক ধারণার কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। পশ্চিম তার নিজস্ব আদর্শে নির্মাণ করেছে মানব শরীর, প্রাচ্য চলেছে তার নিজস্ব পথে। প্রাচ্যে শরীর বা দেহের চিত্রায়ণে প্রাধান্য পেয়েছে তাদের জীবন-দর্শন। পশ্চিমের দেহ বিষয়ক ধারণা স্থূল বহিরঙ্গের একপেশে নির্মাণ। প্রাচ্যে দেহ কেবলই বাহ্যিক অবয়ব নয়, আরো গভীর উপলব্ধির বিষয় জড়িত দেহের সাথে। যার ফলে প্রাচ্যের নারী এবং পুরুষ দেহের রূপায়ণ পাশ্চাত্যের

সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পশ্চিমের মতো এখানে নারী পুরুষের ভোগের সামগ্রী নয়, সে সৃষ্টিশীল স্বতন্ত্র সত্তা। পুরুষও এখানে আক্রমণকারী নয়, পেশিবহুল শক্তপোক্ত শরীরের আগ্রাসী চরিত্র নয়। সে সমাজের মানুষ, বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন পরিচয়। শাস্ত্রীয় পণ্ডিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫২) বলেন:

> ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে সমগ্রদেশে একটি নূতন জাগরণ আসিয়াছিল। [...] মানুষের দেহ সম্বন্ধেও তাঁহাদের (শিল্পীদের) যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। ভারতবর্ষীয় নরনারীর শরীরের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক কোমলতা আছে সে বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শরীরাবয়বের প্রমাণ গ্রহণের জন্য তারা গ্রিকদের জ্যামিতিক পরিমাণ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা জীবন প্রকাশের চেষ্টা করিতেন পত্রাকৃতি রেখা দ্বারা। প্রকৃতির মধ্যে আমরা কোথাও জ্যামিতিক সরল রেখা দেখি না। প্রকৃতির মধ্যে আমরা দেখি জীবনের গতি হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া বঙ্কিমরেখায় চঞ্চল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে,–সে কোথাও স্থির গতিতে সরলরেখার পথে ধাবিত হয় নাই। (দাশগুপ্ত, ২০০৬, পৃ. ৪১)

প্রাচ্য ঘরানায় শরীর সাধনার কেন্দ্র। তাই শরীর কেবলই তার বহিরঙ্গের বিষয় নয়। দেহ-সাধনার দর্শন এদেশের মানুষকে জীবন সম্পর্কে দিয়েছে নিগূঢ়ভাবে দেহকে উপলব্ধির বোধ। এখানে শিল্পী যখনই তার শিল্পকর্মে নিয়োজিত হয়েছে প্রথমেই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে দেহ। কেননা দেহকে উপলক্ষ্য করেই তার বাকি সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক। তাই তার ধ্যান-জ্ঞান ও অধ্যয়নের বিষয় হয়ে এসছে দেহ বা মানব শরীর। শিল্পী বা সাধক প্রত্যেকেই শরীরের বিভিন্ন অংশকেই সৌন্দর্য ও শক্তির উৎপত্তিস্থল হিসেবেই কল্পনা করেছে। বিদ্যা দেহেঝিয়া তাঁর *The Body Adorned: Dissolving Boundaries Between Sacred and Profane in India's Art* গ্রন্থে বলেন:

> The Purusha-sukta pictures every manifestation of power in creation as having emerged from a specific part of his body. The moon emerged from his mind, the sun from his eye, fire from his mouth, wind from his breath, space from his navel, the world of gods from his head, and the earth from his feet. In this manner, even Vedic imagination appears to have visualized a perfect bodily form as the source of all beauty and power. (Dehejia, 2009, p. 18).

পুরো পৃথিবীর সকল বিষয়কে এই যে দেহের সাথে তুলনা করে বুঝতে যাওয়া এটি তাকে করে তুলেছে আরো সংবেদশীল। কেননা পৃথিবীর কোনো কিছুই তার বাইরে নয়, সবই তার দেহে প্রতীকায়িত রূপে বিদ্যমান। এখানে পশ্চিমা পাণ্ডিত্যে সমস্যা হলো তারা প্রতীকী বিষয়কে বাস্তব বস্তুজগতের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করে এসব অবাস্তব হাস্যকর বিষয় বলে আখ্যা দেন। মূলত তাদের আচরণই এক্ষেত্রে শিশুসুলভ, কেননা প্রতীকের সাথে তারা আসল বস্তুকে গুলিয়ে ফেলেন, বুদ্ধিমান মানুষের কাছে নিশ্চয়ই এমনটি আশা করা যায় না। পশ্চিম একটি কাল্পনিক আদর্শ স্থির করে তার মতো করে যে শিল্পকলা তৈরি করেছে, সেটি অনেক বেশি যান্ত্রিক, বহিরঙ্গনির্ভর ও প্রাণপ্রাচুর্যহীন। তাদের বহির্মুখী, কেবলই বাহ্য বিষয়ে আসক্তির কারণে এমন ভাবনায় তারা অভ্যস্ত। কিন্তু এদেশের মানুষ জানে একপেশে বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক ত্রুটি হলো তা জীবন সম্পর্কে

অর্ধেক ধারণা দেয়। প্রাচ্য ভাবধারার সকল শ্রেণির মানুষই বলা যায় অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়। আর এই ভাবধারা যথার্থ হবার কারণ হলো মানুষ একটি বস্তুপিণ্ড নয়; তার ভাবনা, কল্পনা, মনন, বুদ্ধি শুধু বহিরাবরণে ধরা পড়ে না। এদেশের চিত্রশিল্পী অথবা ভাস্করের কাছে একটি প্রধানতম সমস্যা হলো শরীরের ভেতর ও বাহিরের ছন্দময়তা এবং প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা। কবিরা বিভিন্ন উপমা দিয়ে থাকেন যেমন একটি সুন্দর যুবকের চলাফেরা হতে পারে পাহাড়ে একটি তমাল বৃক্ষের মতো। একজন যুবতী হতে পারে বুনোহংসীর চেয়েও সুন্দর পদবিক্ষেপের অধিকারী। কিন্তু চিত্রী বা ভাস্করের সমস্যা তাকে রূপায়ণের। তাই তার বহিরাবরণ দেখে নির্মিতি দিলে সেটি অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সমাজের অংকিত ছবিগুলি চলমান সমাজের সরাসরি বাহ্যিক রূপের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং সমাজে বিরাজমান জীবনদর্শনকে ফুটিয়ে তোলে। বিশ্বজুড়ে পণ্ডিতরা একমত যে, যে শিল্পকর্ম আমরা দেখি তা সরাসরি সমাজের অনুসৃত পদ্ধতি নয়।

> As scholars around the world agree, the human body of any tradition of sculpture and painting—be it Greek, Roman, or Renaissance—is a social construct and not a reflection of life as it was actually lived. Greek sculpture and vase paintings depict nude males, tall and muscular, fighting, competing in sports, and taking part in city processions. But as Andrew Stewart points out, “Not only did Greeks not fight or go about the city naked, they did not look like their marbles and bronzes either. (Dehejia, 2009, p. 34-35).

যেহেতু সরাসরি কেবলই বাহ্যিক রূপের প্রতিফলন শিল্পের মাঝে ঘটে না, তাই শিল্পকলায় বাস্তবতার ধারণাকে আমাদের আলাদাভাবেই দেখতে হবে। জীবনর্দশনের বৈপরীত্যের কারণেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলাদা করে নির্মাণ করেছে তাদের শিল্পকর্ম। এই আলাদা বৈশিষ্ট্যের বিষয় অনুধান করতে সক্ষম হয়েছেন অধিকাংশ বোদ্ধা পণ্ডিতগণ কিন্তু সমস্যা হলো তাঁদের অধিকাংশই বুঝতে গিয়ে একেবারে গোড়ায় গলদ করে বসেছেন। যেমন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারের খনন কাজের সাথে যুক্ত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের ১৯০২ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত মহাপরিচালকের দায়িত্বে থাকা ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শাল (*Sir John* Hubert *Marshall* CIE FBA 1876-1958) তাঁর *The Monuments of Ancient India* নামক রচনায় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপনার বর্ণনা, প্রভাব, শিল্পরূপ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে Greek and Indian ideals অংশে তিনি বলেন:

> Hellenistic art never took a real and lasting hold upon India, for the reason that the temperaments of the two peoples were radically dissimilar. To the Greek, man, man's beauty, man's intellect were everything, and it was the apotheosis of this beauty and this intellect which still remained the keynote of Hellenistic art even in the Orient. But these ideals awakened no response in the Indian mind. The vision of the Indian was bounded by the immortal rather than the mortal, by the infinite rather than finite. Where Greek thought was ethical, his

> was spiritual; where Greek was rational, his was emotional. And to these higher aspirations, these more spiritual instincts, he sought, at a later date to give articulate expression by translating them into terms of form and colour. (Marshall, 1962, p. 588).

মার্শাল স্বীকার করছেন যে, হেলেনিস্টিক প্রভাব ভারতীয় শিল্পের উপর স্থায়ী হয়নি, এর কারণ হিসেবে তিনি বর্ণনা করেছেন দুই আদর্শের বৈপরীত্যকে। এতোটুকু পর্যন্ত তিনি ঠিকই ছিলেন কিন্তু যখন তিনি গ্রিকদের নৈতিকতার বিপরীতে ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক, গ্রিকদের যুক্তিবাদিতার বিপরীতে ভারতীয়দের আবেগসর্বস্ব বলে রায় দিলেন তখনই বোঝা যায় যে, তিনি এই অঞ্চলের জীবন-যাপন ও মতাদর্শ সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবগত নন। কেননা এখানে দর্শনের ইতিহাস মূলত যুক্তিবাদিতার ইতিহাস; ভারতীয় কোনো দর্শনপ্রস্থান অন্যান্য দর্শন ধারাকে যৌক্তিকভাবে খণ্ডন না করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। দর্শনের নয়টি মূল ধারার মাঝে কেবল বেদান্তই পুরোপুরি আধ্যাত্মিক ধারা। যুক্তির চর্চা ও প্রয়োগ এখানে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলমান বলেই এখানে অন্যতম প্রাচীন দর্শন হলো চার্বাক; আধুনিক অর্থে যাদের বলা যায় পুরোদস্তুর বস্তুবাদী। যেখানে আধ্যাত্মিকতার কোনো স্থান নেই। আলাদা করে ন্যায়দর্শনের কথাতো বলাই যায় যেটি পুরোপুরি যুক্তিতর্ক নির্ভর। একারণেই দর্শনে পূর্বপক্ষ বলে একটি পক্ষ সবসময় থেকে গেছে। তাছাড়া তন্ত্র-চার্বাক-সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে আধ্যাত্মিকতা বা আবেগ মুখ্য অবস্থানে নেই। এ সকল প্রচারণা মূলত এদেশের মানুষকে পশ্চাৎপদ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে পুরোপুরি বাস্তববাদী স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার প্রচলন চলে এসেছে। ১৬০৮ সালে তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ (*Tāranātha* 1575–1634) তাঁর *The history of Buddhism in India* গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে বলেন, এখানে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য এতোটাই বাস্তবসম্মত যে ছবিকে প্রকৃত বস্তু বলে বিভ্রম তৈরি হত:

> In the ancient period, the human artists possessed miraculous power and their artistic creations were astounding. In the Vinaya-vastu etc, it is clearly said that the statues made and pictures drawn by them created the illusion of being the real objects. For about a hundred years after the parinirvana of the Teacher, there were many artists like them. (Taranath, 1980, p. 347).

প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শিল্পশাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বহিরাগত তাত্ত্বিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে ছিলো ভিন্ন প্রকৃতির। তারা ধরেই নিয়েছে এই অঞ্চলের সবকিছু আধ্যাত্মিক। জাগতিক বাস্তব জীবনের সাথে এরা পুরোপুরি সম্পর্কিত নয়। অথচ বাস্তুশাস্ত্র, চিত্রশাস্ত্র ইত্যাদির বর্ণনায়ও দেখা যাবে বলা হচ্ছে শিল্পের উদ্দেশ্য হলো বাস্তবতাকে উপস্থাপন। কিন্তু এই বাস্তবতার ধারণা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আলাদা। পশ্চিম বহিরাবরণকে যেমন গুরুত্ব দেয়, প্রাচ্য এর সাথে যুক্ত করে অন্তর্মুখী চেতনার লাবণ্য। কেবলি বহিরঙ্গকে দেহ মনে করাই বরং অবাস্তব কেননা মানুষ আত্মা-মনন-চৈতন্য সম্পন্ন জীব, তাকে উপেক্ষা করাই

অবাস্তব বিষয়, পশ্চিম যা সবসময়ই করে এসেছে; সেই অর্থে পশ্চিমা শিল্পকলাই বরং অবাস্তব, তাদের ভুল আকাঙ্ক্ষার নির্মাণ। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন:

> গ্রিক আর্টের প্রতিভা ও আদর্শের সহিত ভারতীয় আর্টের আদর্শ ও প্রতিভার এতই বৈলক্ষণ্য ছিল যে ভারতীয় অঙ্কন পদ্ধতিতে ও ভারতীয় শিল্পীর চিত্রের মধ্যে গ্রিক আর্ট কোনও স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে নাই। গ্রীষ্মকালের একটি দমকা বাতাসের ন্যায় আসিয়াই বিলীন হইয়া গিয়াছে। (দাশগুপ্ত, ২০০৬, পৃ. ৩৯)।

পশ্চিমা শিল্পতাত্ত্বিক, সমালোচক ও পণ্ডিতবর্গ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার পাশাপাশি অপরকে নিকৃষ্ট বলেও রায় দিয়েছে। সেটি পশ্চিমের সমস্যা হলেও সেখানে শেষ হয়ে যায়নি, কেননা এদেশের পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদের প্রভাব বলয়ে গড়ে ওঠা মননের দেশীয় প্রায় সকলেই পশ্চিমের এই ঘোষণা মেনে নিয়েছেন। এবং ব্যাপকভাবে পশ্চিমা মতবাদ প্রচার করে নিজেদের হীনম্মন্যতা ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছেন।

> ই বি হ্যাভেলও বলেছিলেন যে ক্লাইভ থেকে মেকলে এ দেশের অধিবাসীকে এটা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে এ দেশের নিজস্ব কোন শিল্পপরম্পরা নেই। [...] ফলে শিক্ষিত মানসে আত্মসম্পদ বিষয়ে অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাস থেকে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির নিরিখকে একমাত্র মাপকাঠি মনে করা শুরু হয়েছিল। (সোম, ২০০৪, পৃ. ৭১)

সেই হীনম্মন্যতা ও ইউরোসেন্ট্রিক মনোবৃত্তি এখন দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করছে বাংলায়। জর্জ বার্ডউড তাঁর *The Industrial Arts of India* গ্রন্থে এদেশে ফাইন আর্ট নেই বলে অভিমত দিলেও অনেকটা মুখ ফসকেই যেন বলে ফেললেন, যেখানে শিল্পীরা মিথলজি থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে সেখানে তারা শৈল্পিক দক্ষতার ছাপ রেখেছে:

> The monstrous shapes of the Puranic deities are unsuitable for the higher forms of artistic representation; and this is possibly why sculpture and painting are unknown, as fine arts, in India. Where the Indian artist is left free from the trammels of the Puranic mythology he has frequently shewn an instinctive capacity for fine art. (Birdwood, 1880, p. 125)

একই স্তবকে তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে স্ববিরোধী একটি অবস্থান ব্যক্ত করলেন। যেখানে তাঁর ভাষায় 'ফাইন আর্ট' একেবারেই অপরিচিত, সেখানে কি করে আবার "ফাইন আর্টের" সহজাত ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী থাকে? কাজেই পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের বিচারকে আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে।

পশ্চিমা শিল্পের নারী রূপায়ণের আদর্শ ধরা হয় দেবী আফ্রোদিতির ভাস্কর্যকে। আফ্রোদিতির ভাস্কর্য যখন প্রাচীন গ্রিসে নির্মিত হয়েছে, প্রায় একই সময়ে এদেশে তৈরি হয় দিদারগঞ্জের যক্ষীমূর্তি। এই দুটি ভাস্কর্যের তুলনামূলক বিচারেই সব তথ্য সামনে চলে আসতে পারে। এদেশের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ অক্ষত ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে দিদারগঞ্জের দেবী যক্ষীর ভাস্কর্য। বেলে পাথরে খোদাই করা লাইফ সাইজের

এই নারী ভাস্কর্যটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পালিশ করা। তিনি ঋজুভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ঢালু কাঁধ, পরিপূর্ণ স্তন, সরু কোমর, হালকা ভাঁজসহ বৃত্তাকার পেট, চওড়া কোমর এবং শক্তিশালী উরুসহ একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। উর্ধ্বাঙ্গে মানানসই অলঙ্কার ও কোমর থেকে নিম্নাংশে শাড়ীর মতো বস্ত্র পরিহিত। তিনি শক্তিশালী, দণ্ডায়মান এবং সরাসরি দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিপরীতে দেবী আফ্রোদিতি এবং তার অনুসরণে নির্মিত অন্যান্য ইউরোপীয় ভেনাসের ভাস্কর্যে দেখা যায় হালকা বাঁকানো শরীর, যা ভেনাস বা নারীমূর্তির দুর্বলতার ইঙ্গিত, যিনি সরাসরি দর্শকদের দিকে তাকানোকে এড়িয়ে যান। তিনি তার স্তন ও যৌনাঙ্গ ঢেকে রাখার জন্য নিজের হাত ব্যবহার করছেন। তার নিজস্ব শরীর নিয়ে তিনি লজ্জিত। বিদ্যা দেহেঝিয়ার পর্যবেক্ষণটি প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরা যায়:

> Who is this strong, erect woman who holds herself so proudly and gazes directly at the viewer? She provides a total contrast, for instance, to the roughly contemporaneous and celebrated images of Greek Aphrodite, whose slight stoop and inwardly curved body suggests vulnerability, who avoids eye contact with the viewer, and who uses her hands to cover her genitals and breasts. 10 Like the Greek deity, this figure is the product of a strongly patriarchal society. (Dehejia, 2009, p. 24).

পশ্চিমের পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় নারীর অবস্থান এবং ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থানের এই দুই ভাস্কর্য অক্ষয় পাথুরে দলিল। এদেশে শরীর যেমন সাধনা-মন্দির পশ্চিমে তা নয়। তারা দেহের বহিরঙ্গ নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। আর পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের কারণে পুরুষ হয়ে উঠেছে পরাক্রমশালী, নারী হয়েছে দুর্বল, অবলা, পরনির্ভরশীল। বিপরীতে এদেশে নারী ও পুরুষে অন্তত প্রাচীন প্রাচ্য সমাজে এমন বিভাজন ছিলো না; তার প্রমাণ ইতিহাস, দর্শন, শিল্প-সংস্কৃতি সবকিছুতেই রয়েছে। যদিও বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত মতাদর্শের প্রবল প্রতাপে অনেক কিছুই আমূল বদলে যাওয়ার ফলে আমাদের অধিকাংশ তাত্ত্বিক গবেষকই বিভ্রান্ত হয়েছেন। সাধারণ মানুষ সেখানে তলিয়ে যাবেন এ আর বিচিত্র কি!

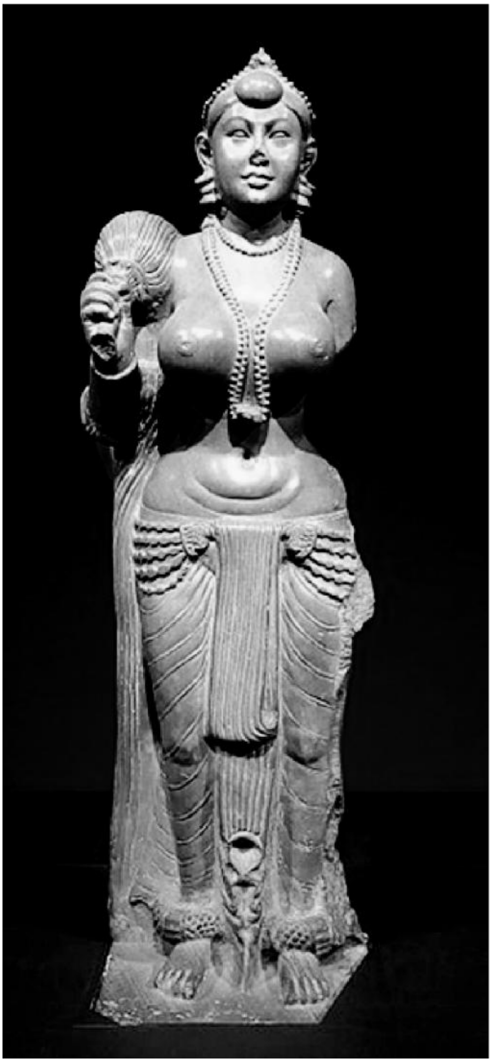

দিদারগঞ্জের যক্ষীমূর্তি।

ভেনাস অব আর্লেস।

আফ্রোদিতি অব নিডোস।

ক্যাপিটোলাইন ভেনাস।

ভেনাস অব মিলো।

ভারতীয় পুরুষের চিত্রায়ণের সাথেও গ্রিসের কোনো সামঞ্জস্য নেই, এর সাথে বৃহৎ প্রাচ্যের বরং বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। জাপানি পণ্ডিত ও শিল্প সমালোচক ওকাকুরা (Okakura Kakuzō 1863-1913) যেমন বলেছেন, “Eastern Asia from the West, Buddhism—that great ocean of idealism, in which merge all the riversystems of Eastern Asiatic thought.” (Okakura, 1920, p. 4)। বৌদ্ধমতাদর্শের ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে তান্ত্রিক মতাদর্শের উপর। তন্ত্রের শরীর শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি হলো যোগ। একজন যোগ-সাধক দেহকে যেমন করে অনুভব করে, দেখে বা উপলব্ধি করে তার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্যের শরীরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পুরো প্রাচ্যের বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার অমিল তাই প্রকটভাবে চোখে পড়ে। এই বৈসাদৃশ্যকে বিবেচনায় রেখেই এদেশের শরীর বিষয়ক ধারণাকে পাঠ করতে হবে। বিদ্যা দেহেঝিয়া বিষয়টি যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন:

> The male figure portrayed on the temples, stupas, and caves of India is smooth, slender, and pliant, with body hair noticeably absent, and displays an idealized gender portrayal characteristic of the Indian tradition. It is a far cry from the musculature of Greek and Roman statues poised in action and, in this respect, bears a closer resemblance to the traditions of China, Korea, and Japan. The term “beautiful” may be applied to the portrayal in art of the Indian male physique, with its gentle oval face, elongated eyes, and full lips, set off by long hair pulled back into an elegant knot. It bears repetition here that the literature of India employed equally for men and women… (Dehejia, 2009, p. 46).

এখানে পুরুষের শরীর পেশিবহুল নয়। আক্রমণকারী বা অসীম শক্তির অধিকারী হিসেবে পুরুষকে উপস্থাপন করা হয়নি, কারণ যোগের সাধন মানুষকে আক্রান্ত ও আক্রমণকারী হিসেবে দেখে না। এখানে পুরুষের দেহরেখা বাস্তব মানুষের মতো, কঠিন জিম করা কিছু বিচ্ছিন্ন মানুষের মতো অতিরিক্ত পেশিবহুল ও অমিত শক্তিশালী হবার কল্পনা নয়। স্বাভাবিক সাধারণ সৌন্দর্য ও বাস্তবতাকে এখানে শিল্পিত রূপ দেয়া হয়েছে। নারীর উপর এখানে পুরুষের প্রভুত্ব নেই, নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। পুরুষ এবং নারীর দেহ নির্মাণের এই প্রক্রিয়া জীবনদর্শনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

উপসংহার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলায় দেহ বা শরীর রচিত হয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও জীবনোপকরণের সাথে ভৌগোলিক বাস্তবতাকে অনুসরণ করে। তাই এই দুই আদর্শের তুলনা করে কোনোটিকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু আমাদের বাস্তবতা হলো বিভিন্ন স্তরের ঔপনিবেশিক প্রভাবে পাশ্চাত্য আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মনে করার একটি সাধারণ প্রবণতা; যা প্রাচ্য শিল্পের অগ্রগতির জন্য একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মনোভাব। স্থানীয় শিল্পকলার প্রতি তৈরি হওয়া অবজ্ঞার কারণে এখানে শিল্পকলা বিষয়ক সমস্ত আলোচনা-পর্যালোচনা ও ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয় পাশ্চাত্যের নির্ধারিত মানদণ্ডে, যা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী হীনম্মন্যতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমা লোগোসেন্ট্রিক বাইনারি মনোবৃত্তির ফলে দেহ বা শরীর বলতে সমসাময়িক শিক্ষিত মানুষ কিছুটা বিভ্রমে পড়ে যান। কেননা দেহ-সাধনা বলতে তারা বোঝেন স্থূল শরীরের সাধনা।

> আমাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন। তাঁরাই মানুষের body-টার দুটো নাম দিয়েছিলেন– ‘দেহ’ ও ‘শরীর’। যখন ভরাট হচ্ছে, বাড়ছে, বৃদ্ধিলাভ করছে, developing, তখন এর নাম ‘দেহ’, আর যখন developed এবং শীর্ণ হবার পালা, তখন এর নাম শরীর। তাই, তাঁরা ‘দেহ’ শব্দটি তৈরি করেছিলেন ‘দিহ্’ ক্রিয়া থেকে, যার মানে ‘বৃদ্ধি পাওয়া’, ‘বাড়া’। শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ গ্রন্থে তাই ‘দেহ’ শব্দের মানে দিয়েছেন– ‘যাহা বাড়ে’। আর ‘শরীর’ শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল ‘শৃ’ ক্রিয়া দিয়ে, যার মানে শীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ, শরীর হল সেই বস্তু ‘যা শীর্ণ হয়’। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা জীবের পার্থিব অস্তিত্বকে পজিটিভ বা নেগেটিভ কোনো দিক থেকেই দেখেননি, দেখেছিলেন body-টা কী করছে সেই দিক থেকে। আর যেহেতু body-টা দুরকম ক্রিয়া করে, তাঁরা তার দুরকম নামকরণ করেছিলেন। (কলিম খান, ২০০৬: ১০১-১০২),

পাশ্চাত্য মতাদর্শের কেবলই বাহ্যিক অবয়ব বা শরীর বিষয়ক ধারণা ও প্রাচ্য মতাদর্শের দেহাত্মবাদী ধারণা কোনোক্রমেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলায় মানব অবয়বের উপস্থাপন যেমন আলাদা, তেমনি এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার। পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষণ ভঙ্গিতে অপরকে দেখার যে দৃষ্টিকোণ সেটি প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট বলে প্রতীয়মান করতে উদ্যত, যা আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি ও দর্শনপ্রস্থানসমূহকে সবসময়ই নিচুমানের বলে বিবেচনায় প্ররোচিত করে। ফলে শিল্পকলা সম্পর্কিত সকল কার্যকলাপেই আমাদের সাধারণত আমাদের ভুল গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এই অবস্থা থেকে

বের হবার জন্য প্রয়োজন নিজস্ব দর্শন-সংস্কৃতি সম্পর্কে যৌক্তিক বিশ্লেষণ। অন্যথায় পাশ্চাত্যের দেখিয়ে দেয়া শিল্প-পদ্ধতিকে অনুসরণ ও অনুকরণের পথ থেকে বের হয়ে প্রাচ্যধারার নিজস্ব শিল্পের স্বাতন্ত্র্যকে অনুধাবন ও চর্চা করে তার সমৃদ্ধি অর্জনের পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হব, যেটি পুরো শিল্পকলার জন্যই কোনো শুভ বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে না।

তথ্যসূত্র

দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (১৯৪২)। *ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা*। চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সোম, শোভন (২০০৪)। *শিল্প সংস্কৃতি সমাজ*। মনচাষা, উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ।

Birdwood, George Christopher Molesworth (1880). *The Industrial Arts of India.* Volume 1. Chapman and Hall Limited, Piccadilly, Lodon.

Clark, Kenneth (1956). *The Nude: a study in ideal form.* Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Coomaraswamy, Ananda K., (1934). *The Transformation of Nature in Art*. Dover Publications, New York.

Dehejia, Vidya (2009). *The Body Adorned: Dissolving Boundaries Between Sacred and Profane in India's Art.* Columbia University Press, New York.

Dehejia, Vidya & Harnisch, Darly Yauner (1997). "Yoga as a Key to Understanding the Sculpted Body". *Representing the Body - Gender Issues in Indian Art.* (Dehejia Vidya, Ed.). Kali for Women, in association with The Book Review Literary Trust, New Delhi.

Franco, Cristiana (2014). *Shameless: The Canine and the Feminine in Ancient Greec.* (Matthew Fox, Trans.) University of California Press Oakland, California.

King, Helen (1998). *Hippocrates' Woman: Reading the female body in Ancient Greece.* Routledge, London and New York.

Kramrisch, Stella (1954). *The Art of India*. The Phaidon Press, London.

Marshall, Sir J.H. (1962). *The Monuments of Ancient India.* The Cambridge History of India, Volume I. (E. J. Rapson, M.A. Ed.), S. Chand & Co. by arrangement with Cambridge University Press, London.

Nead, Lynda (1992). *The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality*. Routledge, USA and Canada.

Okakura, Kakuzo (1920). *The Ideals of The East.* E. P. Dutton and Company, New York.

Stewart, Andrew (1997). *Art, Desire, and the Body in Ancient Greece.* Cambridge University Press, Cambridge.

Taranatha (1970). *Taranatha's History of Buddhism in India*. (Debiprasad Chattopadhyaya, Ed.) (Lama Chimpa and Alaka Chattopadhyaya, Trans.), Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd, Delhi.